ধর্মগ্রন্থের স্বরূপ*

জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মে গুনিন বা পুরোহিত শ্রেনীর চেষ্টায় ধর্মজাদু, মন্ত্রতন্ত্র, পৌরানিক অতিকথা, দেবদেবী এবং পরমেশ্বর কল্পনার প্রাথমিক পরস্পরা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, লিপি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত লিখিত ধর্মগ্রন্থ রচনার কোন সম্ভবনা ছিল না। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের পিরামিডগুলোর দেয়ালের ছবি লিপিতে (hieroglyphs) সর্বপ্রথম মৃত্যুর পরে আত্মার গতি সংক্রান্ত কিছু কল্পনাও মন্ত্রতন্ত্র রচিত হয়েছিল (pyramid texts)। তারপর বড়োলোকদের পাথরের কফিনে খোদাই করা পরলোকতত্ত্ব, এবং আরও পরে পুরোহিতদের দ্বারা প্যাপিরাসে লেখা ছবিলিপির মাধ্যমে এই পরলোকতত্ত্বকে আরও অনেক কল্পনা ও মন্ত্রতন্ত্রে সমৃদ্ধ করে ১৮০ অধ্যায়ের Book of the Dead বা মৃতের শাস্ত্র রচিত হয়। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। এখানেই প্রথম মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মার ডে অফ জাজমেন্ট বা বিচারের দিনের তত্ত্ব পাওয়া যায়। মৃতের আত্মা অনেক কষ্টসাধ্য পথে অনেক মরুভুমি, পর্বত এবং নদী পার হয়ে মৃতদের বিচারক ওসিরিসের দেশে হাজির হয়। সেখানে শেয়াল-মাথা আনুবিস তাকে ওসিরিসের সামনে নিয়ে এলে সে পৃথিবীতে তার সৎ কর্মের ফিরিস্তি দেয়। তারপর থঠ- এর তত্ত্বাবধানে তার হৃৎপিন্ড তুলাদন্ডে মাপা হয়। দোষী সাবস্ত্য হলে তাকে বিয়াল্লিশটি ঘোরদর্শন দানব ছিঁড়ে খায়। আর নির্দোষ প্রমানিত হলে তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে স্বর্গ এক উজ্জ্বল মিশর বিশেষ। সেখানে শস্য খুব লম্বা হয়। কখনো খাদ্যের অভাব হয় না। দুর্ভিক্ষ নেই। এমন কি মানুষের কোন দুঃখ কষ্টও নেই। পৃথিবীর কথা মনে পড়লে আত্মারা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে চেনা জায়গাগুলো এবং প্রিয়জনদের দেখে আসতে পারে। ওসিরিসের সামনে আত্মার বিবৃতি থেকে দেখা যায় যে সেটি কিছু ধর্মীয়-সামাজিক বিধানের প্রতিফলন। আত্মা বলছে যে পৃথিবীতে থাকতে সে কখনো দেবতাদের অমান্য করেনি, দেবতাদের খাদ্য আত্মসাৎ করে নি, মন্দিরের সামগ্রী চুরি করে নি, ইত্যাদি। এগুলো দেবতা-মন্দির-পুরোহিত সংক্রান্ত। আবার কিছু সদাচার ছিল রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অনুশাসন সংক্রান্ত, যথা নরহত্যা না করা, কাউকে অভুক্ত না রাখা, কাউকে না কাঁদানো, জ্ঞাতিদের বিনাশের কারণ না হওয়া, খালের জল বন্ধ বা চুরি না করা, ইত্যাদি। এই মৃতের শাস্ত্র ধর্মগ্রন্থের আবার একটা ধর্মজাদুর গুরুত্ব ছিল। এটিকে অনেক সময় কফিনের মধ্যে দিয়ে দেয়া হতো, যাতে পরলোকগামী আত্মার যাত্রাপথের সব দুর্বিপাক দুর হয়ে যায়।

পুরিহিতেরা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় প্রচার করতে আরম্ভ করে যে এই ধর্মগ্রন্থ এবং সামাজিক অনুশাষনগুলি সম্রাট মেনেস (খ্রিঃ পূঃ ৩২০০) পরলোকের দন্ডদাতা থঠ-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সেই থেকে পরবর্তী কালের প্রায় প্রত্যকটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেই রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় সমর্থনে পুরোহিত শ্রেনী একই দাবি করেছে, এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তায় জনসাধারণের উপর এই বিশ্বাস চাপিয়ে দিবার চেষ্টা করেছে। ব্যবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি নাকি শামাশ বা সূর্য দেবতার ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাষনের সংহিতা গ্রন্থ (code of laws) পেয়েছিলেন। স্বয়ং জেহোভা বা পরমেশ্বর মুসাকে ইহুদিদের জন্য দশটি অনুশাসন (ten commandments) এবং ছয়শো তেরোটি ধর্মনির্দেশ (precepts) প্রদান করেছিলেন। একই ভাবে পরমেশ্বর নাকি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের কাছে বেদ প্রকাশ করেছিলেন, আর মনুকে মনুস্মৃতি প্রদান করেছিলেন। আর স্বয়ং শ্রীভগবান নাকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভগবদগীতা গান করে শুনিয়েছিলেন। প্রাচীন রোমের সম্রাট নিউমা পমপিলিয়াস দেবী এজেরিয়ার কাছ থেকে ধর্মীয় অনুশাষন পেয়েছিলেন। যিশুখ্রীষ্টের জীবন ও বানী সম্বলিত ‘‘নিউ টেস্টামেন্ট ‘‘- এর চার ধর্মকাহিনী (four gospels) নিজ পুত্রের মাধ্যমে

প্রচারিত ইশ্বরের বাণী বলেই খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন। আর কোরান দেবদুত জেবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রত্যাদেশের সংকলন বলেই মুসলিমদের বিশ্বাস।

ব্যবিলন সম্রাট হাম্মুরাবি দ্বারা প্রবর্তিত অনুশাসন সংহিতাটি যে শিলালিপিতে পাওয়া গেছে তারই উপর দিকে সূর্য দেবতা শামশের কাছ থেকে হাম্মুরাবির এই সংহিতা প্রাপ্তির চিত্র খোদাই করা আছে রাষ্ট্র এবং পুরোহিত শ্রেনীও এই তত্ত্ব প্রচার করতো। কিন্তু সংহিতাটি ছিল মূলতো সমাজের শ্রেনীবিভাগ, সম্পত্তি বন্টন, বিচার ব্যবস্থা, বিবাহ ওবিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা, অনুমোদিত সদাচার, এবং বিধি নিষেধ সম্বলিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অলৌকিক উৎসের তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছিল এটিকে রাষ্ট্রশক্তির পরিপূরক শাস্ত্রশক্তি রূপে ব্যবহার করে রাজন্য শ্রেনী ও পুরোহিত শ্রেনী দ্বারা জনসাধারণকে বশীভূত রাখার উদ্দেশ্যে। ব্যবিলনীয় ধর্মে অবশ্য পরলোকতত্ত্ব ছিল, কিন্তু তা পাওয়া যায় গিলগামেশ ও ইশতারের অতিকথায়। ব্যবিলনীয় পরলোকে স্বর্গ নেই। শুধু নরক আছে, যেখানে চির অন্ধকারে যমদুতেরা সব মৃতের আত্মাকেই অবর্ণীয় কষ্ট দেয়। সে কষ্ট লাঘব হতে পারে একমাত্র সাড়ম্বরে এবং পুরোহিতদের নির্দেশে হুবুহু অনুসরন করে মৃতের কবর দিতে পারলে। অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেছেন যে ব্যবিলনীয়দের ধর্মচিন্তকদের একাংশ হয়তো স্বর্গতত্ত্ব রচনা করেছিলেন, বিশেষত যেহেতু প্রাচীন মিশরে স্বর্গতত্ত্ব ছিল। কিন্তু সম্ভবত নরকের ভয় দেখিয়ে কবরে এলাহি ব্যবস্থা থেকে মোটা আয় করার উদ্দেশ্যে পুরোহিত শ্রেনী এই স্বর্গতত্ত্বকে চেপে দিয়েছিল।

গোঁড়া হিন্দুদের বিশ্বাস যে তাদের তিনটি ধর্মগ্রন্থ অলৌকিক উৎস থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রথমটি বেদ, যাকে অপৌরুষেয় ' শ্রুতি ' বা প্রত্যাদেশ বলে কল্পনা করা হয়। মনুস্মৃতি বলছে যে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং অগ্নি, বায়ু এবং সুর্য থেকে ঋগবেদ, সামবেদ, এবং যজুর্বেদ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে যজ্ঞসমুহ যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন হতে পারে (**মনু স্মৃতি, ১/২৩**)। দ্বিতীয়টি মনুস্মৃতি, যেটি নাকি মনু স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন (**মনুস্মৃতি, ১/৫৮**)। আর তৃতীয়টি ভগবদগীতা, যেটি স্বয়ং ভগবানের অবতারের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত বলে কল্পিত এবং সে অবয়বেই রচিত। কিন্তু এই ধর্মগ্রন্থ গুলো আদ্যন্ত পাঠ করলে একমাত্র সেসব মানুষের পক্ষেই এগুলোকে অলৌকিক বলে মেনে নেয়া সম্ভব, যারা হয় ধীশক্তিতে প্রতিবন্ধী, অথবা যারা জন্মলব্ধ ধর্মগ্রন্থকে অন্ধ বিশ্বাসে প্রশ্নাতীত জ্ঞান করেন।

প্রথমে বেদের কথাই ধরা যাক। ঋগবেদ, সামবেদ, যজর্বেদ ও অথর্ববেদ- এই চার বেদের প্রত্যেকটিতেই রচনার ক্রম অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায় আছে। এদের মধ্যে সংহিতা অংশই প্রাচীনতম, যেখানে আছে প্রধানত যজ্ঞের মন্ত্র, অর্থাৎ ধর্মজাদুর শক্তিসম্পন্ন শব্দমালা এবং প্রার্থনা। তারপরের অংশ ব্রাহ্মণ, যাতে আছে প্রধানত যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরন এবং নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ। তারপর আরণ্যক-উপনিষদ, যেখানে আছে প্রধানত আত্মা-পরমাত্মা নিয়ে নানা জল্পনা। সব শেষে আছে সূত্র-বেদাঙ্গ পর্যায়, যেগুলো প্রধানত যাগযজ্ঞের নিয়ম কানুন, পারিবারিক পূজা-উপচার ও নিত্যকর্ম, এবং বিশেষ করে সামাজিক কাঠামোর বিন্যাসের বিধান আর আর্থসামাজিক আইন কানুন এবং বিধি নিষেধ। এই শেষ সুত্র-বেদাঙ্গ পর্যায়ের রচনাগুলোকে অপৌরেষয়(অলৌকিক) বলে গন্য করা হয় না। প্রথম তিন ভাগ, অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক-উপনিষদ অংশকে অপৌরেষয় বলে দাবি করা হয়। বিশেষ করে সংহিতা অংশ শ্রুতি বা দৈব প্রত্যাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন অংশ বলে স্বীকৃত। এর মধ্যে ঋগবেদ সংহিতাকেই প্রাচীনতম সংহিতা বলে বিশেজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম তিনটি বেদেরই স্বকৃতি ছিল। অর্থববেদ সংহিতা পরবর্তী কালে স্বকৃতি পেয়েছিল। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অর্থববেদ-এ ঋগবেদ বহু ঋক এবং সুক্তের পুনরাবৃত্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে সামবেদ সংহিতা-র ৭৫টি ঋক বাদে বাকি সব ই ঋগবেদ সংহিতা থেকে নেয়া। অতএব শ্রুতি বা অলৌকিক

প্রত্যাদেশ হিসেবে ঋগবেদ এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।

প্রধান সমস্যা এই যে, ঋগবেদ সংহিতার অনেক সূক্ত এবং ঋকের সঙ্গে মাজদা ধর্মের আবেস্তা গ্রন্থের অনেক 'গাথার'মিল আছে। দুই ধর্মগ্রন্থেই অগ্নি পূজাভিত্তিক ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ইন্দ্র, মিত্র, বরুন প্রভৃতি কমন দেবতা আছে। আর ঋকবেদ-এর সোম নামক আসবকে আবেস্তীয় ধর্মেও ' হত্তম ' নামে পূজা করা হতো। এ থেকে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমান থেকে বিশেষেজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্যেরা ভারতে আসাবার (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০) আগেই ঋকবেদ সংহিতার কিছু অংশ মৌখিক ভাবে রচিত হয়েছিলো(১)। আর আরণ্যক-উপনিষদের যুগ শেষ হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হরপ্পাসভ্যতার পর থেকে আশোকের শিলালিপির (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) আগে পর্যন্ত ভারতে অন্য কোন লিপির অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায় নি। মেগাস্তিনিস ও তার ভারত বিবরনে লিখেছেন যে ভারতীয়দের কোন লিপি নেই, তারা সব বিদ্যাই কণ্ঠস্থ করে রাখে(২)। এখন প্রায় দেড় হাজার ধরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পুরোহিতেরা যতো সব মন্ত্র-প্রার্থনা আবৃত্তি করেছিল, সেগুলো সব অলৌকিক প্রত্যাদেশ ছিল, একথা কোন মুক্তমনা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন, প্রমান করা দুরের কথা। যদি তিনি কোন বেদ পাঠ না করেই থাকেন যেমন বেশীর ভাগ হিন্দুই করেনি, তবুও। আর যে কোন বেদ পড়লে এ দাবি একেবারে হাস্যকর মনে হবে। কারণ বেদের প্রার্থনাগুলো প্রায় সবই ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক জাগতিক ভোগ বিলাসের চাহিদা। বারে বারে ইন্দ্র, অগ্নি, এবং অন্যান্য দেবতার কাছে যে প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে, তার মধ্যে প্রধান হল আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করো, আমাদের যুদ্ধে জিতিয়ে দাও, আমাকে দীর্ঘ আয়ু দাও, সুস্বাস্থ্য দাও, অনেক গবাদি পশু দাও, অনেক খাবার দাও, প্রচুর পরিমানে গরু-ঘোড়া-মেষের মাংস খেতে দাও,নারীকে বশ করার ক্ষমতা দাও, নারীসংগমে খুব বীর্য ক্ষমতা দাও, আমার জুয়ারী জীবনের হতাশা দূর করো, আমার সপত্নীকে কষ্ট দাও, ইত্যাদি কেবল অসংখ্য দাও দাও। আবার অনেক জায়গাতে, বিশেষত অথর্ব বেদ সংহিতায়, রোগ সারানোর ওষুধ, ভুত তাড়ানোর মন্ত্র, মারন-স্তম্ভন-উচাটনের মন্ত্র ও প্রক্রিয়া, বিশেষত বশীকরনের মন্ত্র সহ এমনসব জাদুর উল্লেখ আছে যেগুলো পড়লে মনে হয় যে এগুলো সম্ভবত ঋকবেদ সংহিতার চাইতেও পুরানো মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাবাহী। আমরা আগেই ধেখেছি যে এসবের মাঝে মাঝে কদাচিৎ দুয়েক জায়গায় সৃষ্টিতত্ত্ব সহ আধিবিদ্যক চিন্তার পরিচয়ও আছে। কিন্তু তুলনাক্রমে জাগতিক চাহিদার সূক্তগুলোই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে এতো বেশি জাগতিক স্বার্থপুরনের চাহিদা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় না। তাছাড়া ঋকবেদে-এ যে সাতাশটি প্রধান দেবতার নাম পাওয়া যায় তার সবগুলোই প্রাকৃতিক বস্তু। কিছু মাটির বস্তু, যেমন- পৃথিবী, অগ্নি, অপ বা জল, সোমরস ইত্যাদি। কিছু আবহাওয়ামন্ডলের দেবতা, যেমন ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। আরও কিছু আকাশের বস্তু, যথা সূর্য(বিষ্ণু), মিত্র(সুর্য), ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি, ইত্যাদি। আমরা আগেই দেখেছি যে এগুলো সবই কোন না কোন রূপে প্রাচীন পশুপালন যুগে এবং কৃষি যুগে দেশে দেশে পূজিত প্রাকৃতিক শক্তি। অনুকুল অথবা প্রতিকুল প্রাকৃতিক শক্তিকে এভাবে স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা দ্বারা সন্তুষ্ট করার চেষ্টার মধ্যে কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ব্যাপার নেই।

মনুস্মৃতি-র আরম্ভে সমবেত মহর্ষিরা মনুকে চাতুর্বর্ণ্য প্রথার পবিত্র অনুশাসনগুলো বর্ণনা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন(**মনুস্মৃতি-১/২**)। এই উপলক্ষে মনু প্রথমে কিছুক্ষন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তত্ত্ব ব্যাখা করে, এবং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এই পবিত্র অনুশাসন পাবার কথা উল্লেখ করে, তারপর বললেন যে তার শিষ্য ভৃগু এবার সেগুলো আবৃত্তি করে শোনাবেন(**মনুস্মৃতি-১/৫৯**)। তারপর ভৃগুর মুখেই মনুস্মৃতি প্রকাশ পেলো। এ থেকে অনুমান করা যুক্তিসম্মত যে ভৃগুই প্রকৃতপক্ষে মনুস্মৃতির রচিয়তা বা সংকলক। ডঃ বি আর আম্বেদকর এ বিষয়ে গবেষনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে পুষ্যমিত্র সুংগের আদেশে সুমতি ভার্গব নামে এক ব্রাহ্মণ পুরানো ধর্মসুত্রগুলোর ভিত্তিতে মনুস্মৃতি রচনা করেন(৩)। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে পূর্বতন ধর্মসুত্রগুলো থেকেই মনুস্মৃতি উদভূত এবং সংকলিত হয়েছিল(৪)। মনুস্মৃতি পাঠ করলেও

বোঝা যায় যে এই ধর্মগ্রন্থ মূলতো চাতুর্বর্ণের সমর্থনে, বিশেষত ধর্মীয় অনুশাসনে শুদ্র অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক শ্রেনীকে অমানবিক হীনস্থানে নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো পুরুষ শাষিত সমাজে নারীর শৃংখলিত হীনস্থানের ধর্মীয় সমর্থন। তাছাড়া রাজাদের দৈব উৎপত্তির তত্ত্বের মাধ্যমে রাজন্য শ্রেনীর নিরংকুশ সার্বভৌমতা এবং শোষন-শাষনের অধিকারও মনুস্মৃতি-তে জোরালো ভাবে সমর্থিত। অবশ্য বিবাহ, সম্পত্তির মালিকানা এবং উত্তরাধিকার, অপরাধ ও দন্ড প্রভৃতি সমাজের সবরকম বিধি নিষেধ ই মনুস্মৃতি-তে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সব ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাষনই রচিত হয়েছিল চাতুর্বর্ণ্য তথা শূদ্র ও নারীর হীনস্থান সহ অসম আর্থসামাজিক কাঠামোকে ধর্মীয় সমর্থনে মহিমান্বিত করবার উদ্দেশ্যে। মনুস্মৃতি-তে অবশ্য বলা হয়েছে যে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র দুইই প্রশ্নাতীত এবং এর কোন একটিকে, অর্থাৎ বেদ অথবা মনুস্মৃতি-কে, যে সন্দেহ করবে তাকে নাস্তিক এবং বেদবিরোধী বলে গন্য করা হবে (**মনুস্মৃতি-২/১০-১১**)। কিন্তু কোন সুস্থচিত্ত মানুষেরই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে মনুস্মৃতি নারীসমাজ সহ সাধারণ মনুষকে, বিশেষত সমাজের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ কৃষক-শ্রেনীকে বশীভুত এবং পদানত রাখবার উদ্দেশ্যে রাজন্য ও পুরোহিত শ্রেনীর শ্রেনীসমঝোতার মাধ্যমে সংকলিত এবং জনসাধারণের উপর বলবৎ করা হয়েছিল(৫)। প্রকৃতপক্ষে পৃথীবির আর কোন ধর্মগ্রন্থে এমন কোন গুরতর আর্থসামাজিক অসাম্যের সমর্থন, এবং মানুষের প্রতি মানুষের এমন নৃশংস ব্যবহারের ধর্মীয় সমর্থন নেই।

ভগবদগীতা গ্রন্থ কে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু অবতারের কন্ঠনিসৃত বানী হিসেবে হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজা করা হয়, মৃত্যুপথযাত্রীদের পড়ে শোনানো হয়, এবং মৃতের বালিশের পাশে বা নীচে রেখে দেয়া হয়। অর্থাৎ একই সংগে এটি ধর্মগ্রন্থ এবং পরলোকযাত্রার জাদুগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। গীতার প্রবক্তাকে অর্জুন যদিও কৃষ্ণ, বাসুদেব, হৃষিকেশ, জনার্দন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু উত্তর ও প্রবচন গুলো সবই ‘‘শ্রীভগবান উবাচ’’ বলে আরম্ভ হয়েছে। অবতারতত্ত্বের অবাস্তবতা সম্বন্ধে ‘‘সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদগীতা’’ গ্রন্থে অলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে যুক্তি প্রমান দিয়ে দেখানো হয়েছে যে আদি মহাভারত কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না, এবং কৃষ্ণের অবতারত্বের কোন চিহ্ন ছিলো না। সুং যুগ থেকে গুপ্ত যুগের মধ্যে, অর্থাৎ খ্রীঃ পুঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত ভার্গব বা ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে পল্লবিত মহাভারতেই ক্রমশ কৃষ্ণ চরিত্রের উপর অবতারতত্ব আরোপিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু ছাড়া অন্য কারো অবতারের কল্পনা নেই, আর এই বিষ্ণুর অর্থ সূর্য। খ্রীষ্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এ দেশে এক সূর্য উপাসক ভাগবত সম্প্রদায় ছিল, আর সেখান থেকেই ব্রাহ্মণদের কলমের গুনে কল্পিত কৃষ্ণ অবতারের সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবদগীতা কয়েকশো বছর ধরে অনেক লেখকের রচনা, এবং শ্রী ভগবানের বক্তব্যগুলোর মধ্যে অনেকগুলো উপনিষদ, সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের অনেক পুনরাবৃত্তি, অনুকরন আছে, এবং অনেক পৌরানিক কল্পকাহিনীর উল্লেখসহ অনেক স্ববিরোধিতা এবং অনেক অবৈজ্ঞানিক কথা আছে(এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আলোচনা করা হবে- অনুলেখক)। ভগবদগীতা-য় শ্রী ভগবানের বক্তব্যের মুল উদ্দেশ্য ছিলো ধর্ম সুত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে সমর্থিত চাতুর্বন্য প্রথা, এবং শুদ্র ও নারীর আর্থসামাজিক হীনস্থানের কাঠামোকে ভগবানের নিজ সৃষ্টিরুপে দেখিয়ে সেগুলোকে মহিমান্বিত করা। আর এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শোষন ও দমনপীড়ন মূলক অসম আর্থসামাজিক কাঠামোকে ঐশ্বিরীয় সমর্থনে আমজনতার উপর চাপিয়ে দেয়া (৬)। গীতার প্রধান ভাষ্যকার শংকরাচার্য তার গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকাতে স্পষ্টই বলেছেন যে বিপন্ন চাতুর্বর্ণ্যের পুনঃপ্রতিষ্টার জন্যই শ্রীভগবান অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভুত হয়েছিলেন।

গীতার শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র মাত্র, ঈশ্বরের অবতার বা অন্যকোন কল্পিত মানুষ নন। জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতার ফলে সমকালীন আর্য সভ্যতা যে গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলো, সে ঐতিহাসিক সংকট থেকে পরিত্রান পাবার উদ্দেশ্যে এক দিকে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ম্লেচ্ছ অনার্য তথা ভূমিপুত্র অনার্যদের বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্ম এবং

নাস্তিকতাবাদের কঠোর সমালোচনা করে, আর অন্য দিকে মনুস্মৃতির সংগে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভাগবতধর্মের কিছু ইতিবাচক বক্তব্যকে সমন্বিত করে ভগবদ গীতা রচিত হয়েছিল আর তা আরোপিত হয়েছিল শ্রী ভগবান চরিত্রের মুখে। গীতার রচয়িতাদের আশা ছিল যে এভাবে চাতুর্বর্ণ্য এবং শুদ্র ও নারীর হীনস্থান আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেনীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রভুত্বকে বিস্তারিত ও চিরায়ত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ভগবদ গীতা ছিলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেনীর হাতে আমজনতার শোষন-শাসনের ধর্মীয় হাতিয়ার মাত্র(৭)।

>>>পরবর্তী পর্ব... >>>

পাদটিকাঃ-

(১) surendranath Das Gupta, A History of Indian Philosophy, Motilal Banarsidas, Delhi, 1992(first edition Cambridge, 1922), Vol-1, pp-14-15

(2) মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরন, গ্রিক থেকে রজনীকান্ত গুহ দ্বারা অনুদিত, বারিদিবরন ঘোষ সম্পাদিত, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন,১৯৯৩(প্রথম প্রকাশ ১৯১১), পৃঃ ১০৬

(৩) Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Education Department, Government of Maharashtra, vol. 3, pp. 270-271

(৪) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, G.Buhler, The Laws of Manu, Clarendon Press, oxford, 1986, Introduction.

(৫) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ান্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৯৩(দ্বিতীয় সংস্করন); সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদগীতা, এলাইড পাবলিসার্স, কলকাতা- ১৯৯৪।

(৬) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ান্তনুজ বন্দোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদগীতা, ঐ, পরিচ্ছেদ ৫, ১০।

(৭) ঐ।

** প্রবন্ধটি লেখকের '' ধর্মের ভবিষ্যত '' গ্রন্থ থকে সংগৃহীত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত।*

অনুলিখন : অনন্ত
০৫-০২-০৫
ananta_atheist@yahoo.com

পরবর্তী পর্ব...